[redacted]

[redacted]

মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৭ দশমিক ৮২ শতাংশ।

১২ মাসের গড় হিসাবে (২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর) দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক ২৯ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতে নীতি সুদহার ও ব্যাংক ঋণের সুদহার বাড়নোসহ নানা ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকার। তার আগের অর্থবছরে (২০২১-২২) গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬ দশমিক ১৫ শতাংশ।

আইএমএফ প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবে ভারসাম্যে ঘাটতি অব্যাহত থাকবে।

আইএমএফ প্রতিবেদনে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও বিস্তারিত বলা হয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিজনিত সংকট থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে বিশ্ব অর্থনীতি। যুদ্ধের কারণে খাদ্য ও জ্বালানি বাজার বিঘ্নিত হয়েছে; সেই সঙ্গে উচ্চ মূল্যস্ফীতির রাশ টানতে নীতি সুদহার অভূতপূর্ব হারে বাড়ানো হয়েছে-এসব কারণে বিশ্ব অর্থনীতি গতি হারালেও থমকে যায়নি।

আইএমএফ বলেছে, মূল্যস্ফীতির হার অভূতপূর্ব উচ্চতায় উঠে গেলে গত বছরের শেষ বিশ্ব অর্থনীতির কার্যক্রম সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে, যদিও মূল্যস্ফীতির হার ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসেছে।

আইএমএফ বলেছে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক মন্দা হওয়ার আশঙ্কা নেই। অর্থনীতির বিশেষ ক্ষতি না করে মূল্যস্ফীতির হার কমিয়ে আনা সম্ভব হবে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটি উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রেকর্ড হারে নীতি সুদহার বাড়ালেও বেকারত্ব তেমন একটা বাড়বে না বলেই পূর্বাভাস।

যুক্তরাষ্ট্রের `যুদ্ধ’ নিয়ে

দেশের মানবাধিকার কর্মীরা চুপ কেন?

একের পর এক দেশের সঙ্গে সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত যুক্তরাষ্ট্র। ‘বাধানো’ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন আমেরিকার সৈন্যসহ অসংখ্য নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিক। এনিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন খোদ মার্কিন নাগরিকরা। তবে তাতে তোয়াক্কা করেনি যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের নানা বিষয়ে মানবাধিকার কর্মীরা সরব ভূমিকা পালন করলেও যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ যুদ্ধ নিয়ে কোনো টুঁ শব্দ করছেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ মনে করেন, বাংলাদেশে যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন তারা বেশিরভাগই যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পশ্চিমা দেশের অর্থায়নে কাজ করেন। সুতরাং মানসিকভাবেই তারা পশ্চিমাজগতে বাস করেন।

হঠাৎ করেই শুরু হওয়া ফিলিস্তিন-ইজরায়েল ‘যুদ্ধ’ বিষয়ে মানবাধিকারের কথা না বললেও যুদ্ধে জয়ী হতে সরাসরি ইজারায়েলকে সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাইডেন প্রশাসন। তবে ইজরায়েলকে সহায়তা দেওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। যুক্তরাষ্ট্রের মদদে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অধিকাংশ যুদ্ধের আইনি ভিত্তি নেই বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আইনি বিশ্লেষকরা।

একটি পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিশ্বের ১৫৩টি অঞ্চলে সংঘটিত ২৪৮টি সশস্ত্র সংঘাতের মধ্যে ২০১টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা সমর্থিত ছিল, যা মোট সংখ্যার ৮১ শতাংশ। এর মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ‘বৈধ পদ্ধতির’ মাধ্যমে চালিয়েছিল যা তারা নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য জাতিসংঘকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে এর বেশির ভাগই ছিল মানবাধিকারের নামে যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু করা অবৈধ যুদ্ধ।

২০০৪ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান ইরাক যুদ্ধ নিয়ে অনেক সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি জাতিসংঘ সনদের সঙ্গে ‘সামঞ্জস্যপূর্ণ’ নয়। নিরাপত্তা পরিষদের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের যুদ্ধে যাওয়ার পদক্ষেপের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। শুধু তাই নয় ইরাক যুদ্ধের সময়

মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ইরাকে ঠিকাদারি কর্মকর্তার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত থাকার সময় এক ঠিকাদারের কাছ থেকে হাজার হাজার ডলার গ্র্যাচুইটি গ্রহণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে।

আফগানিস্তান ও ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের ‘দীর্ঘ ও ভিত্তিহীন’ যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অবৈধ এবং মার্কিন সংবিধান লঙ্ঘন করে অঘোষিত যুদ্ধ বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এই যুদ্ধগুলো রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটিক উভয় দলের এবং আমেরিকান সংবাদ মাধ্যম দ্বারা ব্যাপকভাবে সমর্থিত ছিল। তার আগে ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে সামাজিক আন্দোলন তৈরি হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি বিতর্কিত হাতিয়ার হচ্ছে ড্রোন হামলা। নিউইয়র্ক টাইমস এক অনুসন্ধানি প্রতিবেদনে বলেছিল ড্রোন হামলায় কে মারা যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই! যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসেও এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল। কেউ কেউ এটাকে বিচারবহির্ভূত হত্যা হিসেবেও আখ্যায়িত করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের সর্বশেষ মানবাধিকার বিষয়ক প্রতিবেদনে বলেছে, গতবছরের মে মাসে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অভিযানের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ ফিলিস্তিনি-আমেরিকান সাংবাদিক শিরিন আবু আকলা হত্যার নিন্দা জানিয়েছে বাইডেন প্রশাসন। ওয়াশিংটন পোস্ট, সিএনএন এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয়সহ একাধিক স্বাধীন তদন্তে দেখা গেছে, একজন ইসরায়েলি সৈন্য তাকে হত্যা করেছে। গত বছরের নভেম্বরে এফবিআই তার মৃত্যুর তদন্ত শুরু করে। ইসরায়েল গত সেপ্টেম্বরে স্বীকার করে যে আবু আকলা সম্ভবত একজন ইসরায়েলি সৈন্যের গুলিতে নিহত হয়েছেন, তবে যদি তাই হয় তবে এটি দুর্ঘটনাজনিত এবং তারা মার্কিন তদন্তে অংশ নেবে না।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রেসিডেন্ট বাইডেন গুয়ানতানামো বে-তে অবস্থিত মার্কিন সামরিক কারাগার বন্ধ করার অঙ্গীকার করলেও ৩৬ জন বিদেশি মুসলিম এখনো রয়ে গেছেন, যাদের অধিকাংশই দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কোনো অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই আটক রয়েছেন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলায় অভিযুক্ত পাঁচ গুয়ানতানামো বন্দির বিচার ত্রুটিপূর্ণ সামরিক কমিশনে স্থগিত করা হয়েছিল। আসামিরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ দোষীদের আবেদনের বিনিময়ে মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেছিলেন।

বিশেষ করে জিনি প্রসেকিউটর ছিলেন তাকে আমেরিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আমাদের জারা মানবাধিকার কর্মী আছে তার এগুলো নিয়ে কথা বলবে না। কারণ বাংলাদেশে যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন তারা বেশিরভাগই যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পশ্চিমা দেশের অর্থায়নে কাজ করেন। সুতরাং মানসিকভাবেই তারা পশ্চিমাজগতে বাস করেন।

নিজের স্বার্থে ফিলিস্তিনিদের বিপক্ষে আমেরিকা: মানবাধিকার কোথায়?

বাংলাদেশে মানবাধিকারের ইস্যু তুলে বারবার সরকারকে কাঠগোড়ায় তোলার চেষ্টা করে যুক্তরাষ্ট্র। অথচ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কিছুই বলেনা আমেরিকা। ইসরায়েলের বিমান হামলায় এ পর্যন্ত অন্তত ২৫০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। প্রাণ গেছে শিশু-নারীদের। মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে নিশ্চুপ ওয়াশিংটন।

সমুদ্র উপকূলীয় ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজাকে দীর্ঘদিন ধরেই ইসরায়েল অবরুদ্ধ করে রেখেছে। প্রায় বিচ্ছিন্ন এই ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে সশস্ত্র গ্রুপ হামাস। হামাসের রকেট হামলার জবাবে প্রায়ই ইসরায়েলি বাহিনী স্থল ও আকাশপথে ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ করা হামাস গ্রুপ শনিবার ভোর থেকে স্থল, জল ও আকাশপথে সমন্বিত হামলা করে ইসরায়েলে। এদিকে হামাসের হামলার পর গাজায় পাল্টা বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এ পর্যন্ত কমপক্ষে ২৫০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

ইসরায়েলে এ হামলার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো। হামাসের এ হামলাকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ আখ্যা দিয়ে প্রতিরক্ষা সমর্থনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির জাতীয় জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র অ্যাড্রিয়েন ওয়াটসন বলেন, ‘আমরা ইসরায়েলের সরকার ও জনগণের সঙ্গে আছি। এই হামলায় ইসরায়েলিদের প্রাণ হারানোর জন্য সমবেদনা জানাচ্ছি।’ হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে বলা হয়, ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের

উপদেষ্টা জাচি হানেগবির সঙ্গে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপদেষ্টা জেক সুলিভান।

শনিবার বাইডেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ফোন কল করে বলেন, ‘আমরা ইসরায়েলের সরকার ও জনগণকে সব ধরনের সমর্থন দিতে প্রস্তুত আছি।’ পরে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘সন্ত্রাস কখনই ন্যায়সংগত হতে পারেন না। ইসরায়েলের নিজেকে এবং তার জনগণকে রক্ষা করার অধিকার রয়েছে।’ এই পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোনো পক্ষ সুবিধা নিতে চায় কি না সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৬৭ সালের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যকার সম্পর্ক দ্রুতগতিতে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় মার্কিনীরা ইসরায়েলের পক্ষ নেয়। এই সিদ্ধান্ত দুই দেশের সম্পর্কের মজবুত ভিত্তি রচনা করে। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও কূটনীতিকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব কমাতে ইসরায়েল তাদের কার্যকরী এক অস্ত্র হতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকেই ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র আরো ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এই যুদ্ধে মার্কিনরা বেশ সফলতাও অর্জন করে এবং নিজেদের বিশ্বের একমাত্র সুপারপাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পারে, মধ্যপ্রাচ্যে তাদের এমন একটি মিত্র দরকার, যারা তাদের প্রতিরূপ হিসেবে কাজ করবে। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক দূরত্বের একটি বিষয় ছিল। সেই সমস্যা নিরসনে শক্ত ঘাঁটি বিনির্মাণের জন্যই তারা বেছে নেয় ইসরায়েলকে। যুক্তরাষ্ট্র তখন ইসরায়েলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরির জন্য তাদের হয়ে ফিলিস্তিনের সাথে দেনদরবার করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের আশ্বাসের কারণেই এখনো ইসরায়েল যেকোনো শান্তি আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি হয়। বিগত তিন মার্কিন প্রেসিডেন্টই চেষ্টা করেছেন ফিলিস্তিনের সাথে ইসরায়েলের একটি সুরাহা করার। তবে এক্ষেত্রে তাদের সমর্থনের পাল্লা তেল আবিবের দিকেই বেশি থেকেছে। যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই ইসরায়েলের অনেক অপরাধ দেখেও না দেখার ভান করে থেকেছে, যা অব্যাহত রয়েছে বর্তমানেও। কিন্তু এর পেছনের রহস্য কী? শুধু মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য তারা ইসরায়েলকে সমর্থন করে, নাকি আরো কোনো কারণ রয়েছে?

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সম্পর্ককে বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল কূটনৈতিক সম্পর্কও বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাব সৃষ্টির জন্য ইসরায়েল যেমন প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রও তাদের বড় অঙ্কের আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। তবে এরপরও দুই দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, যেখান থেকে লাভবান হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৮৫ সালে ইসরায়েলের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করে যুক্তরাষ্ট্র। এরপর থেকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের হার অনেক বেড়েছে। ইসরায়েলে থাকা মার্কিন দূতাবাসের তথ্যমতে, ২০১৬ সালে দুই দেশ প্রায় ৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যবসা করেছে, যা থেকে সিংহভাগ লাভবান হয়েছে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে ইসরায়েল।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ইসরায়েল বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি বাজার। দেশটির বিভিন্ন রাজ্য ইহুদিপ্রধান দেশটির সাথে বিভিন্ন ব্যবসা করে আসছে, যা থেকে সামগ্রিকভাবে মার্কিন অর্থনীতি লাভবান হচ্ছে। বলা হয়ে থেকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রকে তার কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি দিয়েছে। এর প্রতিদান অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রও কম দিচ্ছে না!

এছাড়াও আরো গভীরে গেলে দেখা যায় যে, আমেরিকার রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে মূলতঃ কর্পোরেট হাউজগুলো। তারা প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত বানাতে পারে, সরাতে পারে। এসব কর্পোরেট হাউজগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় এদের মালিক কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম্পানিগুলোর মূল দায়িত্বে থাকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা চীফ এক্সজিকিউটিভ অফিসার, সিইও হলেন ইহুদি কমিউনিটির মানুষ।

২০২০ সালে, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে ৩.৮ বিলিয়ন (৩৮০ কোটি) ডলার সাহায্য দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ওবামার শাসনামলে ইসরায়েলকে দীর্ঘমেয়াদী যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার অধীনেই এই সাহায্য গেছে। প্রায় পুরোটাই ছিল সামরিক সাহায্য।

২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট ওবামা ইসরায়েলের সাথে এক চুক্তি সই করেন যার অধীনে ২০১৭-১৮ সাল থেকে তার পরবর্তী ১০ বছর ইসরায়েল ৩৮ বিলিয়ন ডলার বা ৩৮০০ কোটি ডলার সামরিক সাহায্য পাবে। তার আগে দশ বছরের তুলনায় ঐ সাহায্য বেড়েছে প্রায় ছয় শতাংশ।

এ বাদেও, গত বছর ইসরায়েলে নতুন অভিবাসীদের পুনর্বাসনে যুক্তরাষ্ট্র ৫০ লাখ ডলার সাহায্য দিয়েছে। বিশ্বের যে কোনো দেশ থেকে ইহুদিরা ইসরায়েলে গিয়ে বসতি গড়তে চাইলে তাকে স্বাগত জানানোর নীতি বহুদিন ধরে সেদেশে রয়েছে।

ইসরায়েলকে অত্যাধুনিক একটি সামরিক শক্তিধর দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে আমেরিকা বছরের পর বছর ধরে সাহায্য করছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র কেনার জন্য তহবিল যোগানো হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসরায়েল আমেরিকা থেকে ৫০টি অত্যাধুনিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান কিনেছে যা দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো যায়। প্রতিটি বিমানের দাম প্রায় ১০ কোটি ডলার। ইসরায়েল আমেরিকার কাছ থেকে ২৪০ কোটি ডলার ব্যয়ে আটটি কেসি-৪৬এ বোয়িং ‘পেগাসাস‘ বিমান কিনেছে। এই বিমান থেকে আকাশে এফ-৩৫ বিমানে জ্বালানি তেল ভরা যায়।

২০২০ সালে ইসরায়েলকে আমেরিকা যে ৩৮০ কোটি ডলার দিয়েছে, তার মধ্যে ৫০ কোটি ডলার খরচ হয়েছে ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থায়। এর মধ্যে রয়েছে ‘আয়রন ডোম‘ ক্ষেপণাস্ত্র নিরাপত্তা যা দিয়ে ইসরায়েল রকেট হামলা প্রতিহত করে। ২০১১ সাল থেকে আমেরিকা ইসরায়েলের ‘আয়রন ডোম‘ নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য ১৬০ কোটি ডলার দিয়েছে। এ ছাড়াও, গাজায় গোপন সুড়ঙ্গ শনাক্ত করা সহ বেশ কিছু সামরিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তৈরিতে আমেরিকা ইসরায়েলকে তহবিল ছাড়াও বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে। ইসরায়েলের সরকার সমরাস্ত্র কেনা এবং সামরিক প্রশিক্ষণে বহু টাকা খরচ করে যার অনেকটাই আসে আমেরিকার দেওয়া সাহায্য থেকে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পেছনে আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি (আইপ্যাক)-এর অবদানকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আইপ্যাক কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়। কিন্তু এরপর তাদের যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের উপর বড় প্রভাব রয়েছে। মার্কিন সরকারের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিভিন্ন সিদ্ধান্তে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে থাকে। কিন্তু তারা এই কাজ করে কীভাবে?

‘কংগ্রেশনাল ক্লাব’ নামে আইপ্যাকের বিশেষ একটি দল আছে। এই দলের প্রত্যেক সদস্য প্রতি নির্বাচনে সর্বনিম্ন পাঁচ হাজার ডলার চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর এই অর্থ ইসরায়েলপন্থী রাজনীতিবিদদের নির্বাচনে ব্যয় করা হয়। পরবর্তীতের এদের মধ্যে যারা জয়লাভ করে, তাদের মাধ্যমে সিনেট এবং হাউজে প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের নীতির

দুর্নীতিতে জর্জরিত যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের নিয়ে মাথা ঘামায় না

ইউক্রেন যুদ্ধের তহবিলকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার আইনপ্রনেতাদের ভোটে পদচ্যুত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রে এমন ঘটনা প্রথমবারের মতো ঘটলো। সোমবার মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থির বিরুদ্ধে আনা এই অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়েছে। অভিযোগটি তুলেছিলেন তার দল রিপাবলিকান পার্টির একজন আইনপ্রণেতা ম্যাট গ্যাটেজ। অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ২১৬ ভোট এবং বিপক্ষে পড়ে ২১০ ভোট।

ইউক্রেনে তহবিল সংক্রান্ত হোয়াইট হাউজের সঙ্গে গোপনে একটি চুক্তিতে যাওয়ার জন্য ম্যাকার্থির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন গ্যাটেজ। যদিও বিষয়টি অস্বীকার করে স্পিকার ম্যাকার্থি বলেন, ইউক্রেন ইস্যুতে আলাদা কোনও চুক্তি হয়নি।

শুধু ম্যাকার্থি নয়, যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতা, সিনেটর সহ অনেকের বিুরদ্ধে ঘুষ দুর্নীতির অভিযোগ আছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নানান অভিযোগে এখন আদালতে চক্কর দিচ্ছেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে তাঁর ছেলে হান্টার বাইডেন ও ভাইদের বিরুদ্ধে ট্যাক্স ফাঁকিসহ ক্ষমতার অপব্যবহারের। এসব অভিযোগের তদন্ত চলছে।

গত ২২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সিনেটর বব মেনেনডেজ ও তাঁর স্ত্রী নাদিন দুর্নীতির অভিযোগ অভিযুক্ত হয়েছেন। মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান মেনেনডেজের বিরুদ্ধে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো দুর্নীতির অভিযোগ আনা হলো। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিসের সূত্রমতে, মেনেনডেজ ও তাঁর স্ত্রী নিউ জার্সির তিন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সোনা, নগদ অর্থ, বিলাসবহুল গাড়ি ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ ঘুষ নিয়েছেন। এসবের পরিমাণ কয়েক লাখ ডলার। নিউ জার্সির ডেমোক্রেটিক পার্টির

না। অন্যদের বিষয়ে তাদের মাথা ব্যাথা বেশি। তিনি বলেন, কোথাও কোনো ভুল হলে তারা পরামর্শ দিতে পারে। যেহেতু তারা আমাদের উন্নয়ন সহযোগি তারা এটা দিতে পারে। কিন্ত স্যাংশন, নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে না। আমাদের পক্ষ থেকেই কেউ না কেউ তাদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা করছে, এ কারণেই তারা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

আরেক সাবেক কূটনীতিক মুন্সি ফয়েজ আহমেদ বলেন, তারা নিজের দেশেই যেটা মানে না সেটা তারা অন্যের দেশে প্রয়োগ করে। তারা কোনোভাবেই স্যাংশন দেওয়ার অধিকার রাখে না। তারপরও তারা সেটা করেছে। কই, তারা তো পাকিস্তান, মিশরের বিরুদ্ধে কোনো স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। সেসব দেশে তো খুব খারাপ অবস্থা। গণতন্ত্র নেই।

তিনি বলেন, মূলক আমেরিকা ‘‘সংকীর্ণ ও সাময়িক স্বার্থ ’’ এসব কাজ করে। এটা কোন পক্ষের জন্যই ভালো ফল বয়ে আনে না। আর দীর্ঘমেয়াদে তো নয়ই। কোনো পক্ষই উপকৃত হতে পারে।

মুন্সি ফয়েজ আহমেদ আরও বলেন, বাংলাদেশের দোষ দেখার মত তাদের আঙ্গুল দেওয়ার সুযোগ নেই। ভুলভ্রান্তি হলে তারা কূটনৈতিক পদ্ধতিতে পরামর্শ দিতে পারে। ধরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু পাবলিকলি এগুলো বলে আমাদের দেশকে তারা করা হয়। এটা মনে রাখতেম হবে তারা নিজেদের স্বার্থই এসব নিষেধাজ্ঞা, স্যাংশন দেয়।

তিনি বলেন, আমেরিকা বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বাজায়, সেসব দেশে যুদ্ধে সহযোগিতা করতে তাদের সৈন্য পাঠায়। কিন্ত তাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙনের বিচার করা যাবে না। ঘুষ দুর্নীতি প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে। ট্রম্পের বিরুদ্ধে তো নানান অভিযোগে বিচার শুরু হয়েছে।

গণমাধ্যমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া

ভিসানীতি অবমাননাকর

দেশের গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করতে মার্কিন ভিসানীতি, যা দেশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের সামিল বলে মনে করছেন সাংবাদিক নেতারা। মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সমাবেশ থেকে এ মন্তব্য করা হয়। এসময় ভিসানীতির নামে স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ মানা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

জাস্টিস ফর জার্নালিস্ট আয়োজিত ভিসানীতির নামে সংবাদমাধ্যমে মার্কিন চাপের প্রতিবাদে সাংবাদিক সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা, ডিবিসি টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ও দ্য ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী। সমাবেশে তিনি বলেন, ‘একটি স্বাধীন দেশের গণমাধ্যমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ভিসানীতি অবমাননাকর। দেশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের সামিল।’

তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ চলে সংবিধানের ওপর। একটি স্বাধীন দেশের ওপর বাইরের দেশের হস্তক্ষেপ মানি না মানবো না। আমেরিকা বন্ধুর আচরণের বিপরীতে প্রভুর আচরণ করতে চায়। আমরা সেটি মানবো না। তারা ভিসানীতির ভয় দেখিয়ে অযাচিত হুমকি দেবেন, সেটা মেনে নিতে পারি না। বাঙালি জাতিকে ভিসানীতি বা স্যাংশনের ভয় দেখিয়ে আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না। আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়াবো। নিজের শক্তি দিয়ে গণতান্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই।’

জাস্টিস ফর জার্নালিস্ট সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ওবায়দুল হক খানের সভাপতিত্বে এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, সাবেক মহাসচিব আবদুল জলিল ভূঁইয়া, ডিইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মানিক লাল ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম, ডিইউজের সাবেক সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, সংগঠনের সভাপতি কামরুল ইসলাম, সদস্য সচিব সাহিন বাবু, সিনিয়র সাংবাদিক লায়েকুজ্জামান, আবু সাঈদ প্রমুখ।

এসময় মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বলেন, ভিসানীতি নিয়ে আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন নই। আমেরিকা বছরে ভিসা দেয় মাত্র ২৭ হাজার। এতে সারাদেশে মানুষের কি সমস্যা। ভিসানীতি তো তাদের আছেই, প্রতি বছর ১ লাখ আবেদন করে আর ভিসা দেয় ২৭ হাজার।

তিনি আরও বলেন, ‘আমেরিকার গণমাধ্যম স্বাধীন। সেখানে পিটার হাস এ

কথা বলতে পারেন না। অথচ বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ওপর ভিসানীতির কথা বলছেন পিটার হাস। এটা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর একটি চাপ সৃষ্টি করা। ভিসাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায় পিটার হাস আপনি অতিথি মানুষ। তাই আপনার নীতির মধ্যে থাকুন। বাংলাদেশের স্বাধীন গণমাধ্যম কোনো আত্মসমর্পণ করে না। করবে না।’

আবদুল জলিল ভূঁইয়া বলেন, ‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কথা উঠলেই একাত্তর সালের কথা মনে পড়ে। খুনিদের সরদার আমেরিকা। ডিইউজের যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম বলেন, আমার দেশ আমার। তুমি মার্কিনি কথা বলার কে।’

এসময় অন্য নেতারা বলেন, ‘আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কিভাবে কলুষিত করা যায়, সেই চেষ্টা করছে। আমেরিকা ভিসানীতি দিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। বাঙালি জাতিকে ভয় দেখানো সহজ নয়।’ গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান তারা।

এই প্রস্তাব দিতেই পারেন না আবিগেইল বয়েড

“বাংলাদেশকে ম্যাগনিটস্কি স্টাইল স্যাংশন দেয়া উচিত অস্ট্রেলিয়া সরকারের” গত ২১ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস পার্লামেন্টে ‘অস্ট্রেলিয়ান গ্রিনস’ দলের এমপি আবিগেইল বয়েড এমপির এমন প্রস্তাব জানার পরপরই কয়েক দফা প্রশ্ন তুলেছেন নামী কূটনিতিকরা।

প্রথমত তারা বলছেন, ম্যাগনিটস্কি স্টাইল স্যাংশন দেয়ার শুরু হয়েছিল একটি বিশেষ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার মধ্য দিয়ে। মূলত, ২০০৯ সালে রাশিয়ার কারাগারে নির্যাতনের শিকার হয়ে সের্গেই ম্যাগনিটস্কির নামে এক রুশ ট্যাক্স আইনজীবী হয়। মৃত্যুর পর ২০১২ সালে ম্যাগনিটস্কি আইন পাস করে যুক্তরাষ্ট্র। পরে তারা এই স্যাংশন দেয় ম্যাগনিটস্কির খুঁজে বের করা ৩৯ জন দুর্নীতিগ্রস্ত রাশিয়ানের ওপর। যারা ম্যাগনিটস্কির মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত ছিল।

প্রাদেশিক সংসদে বাংলাদেশের উপর ম্যাগনিটস্কি স্টাইলে স্যাংশন আরোপের দাবি তোলার আগে, পূর্বে অস্ট্রেলিয়ান সরকার মাত্র একবার ২০২২ সালে এই স্যাংশনের প্রয়োগ করে। তাই প্রশ্ন উঠেছে, ম্যাগনিটস্কি স্টাইলে আবিগেইল বয়েড যে স্যাংশন আরোপ করতে বলেছেন সেটা কী আইনত অস্ট্রেলিয়ার সরকার দিতে পারে? কারণ অস্ট্রেলিয়াতেই তো বৈধ নয় ম্যাগনিটস্কি স্টাইল স্যাংশন।

একটু পেছনে ফিরে তারা বলেন, ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার লেবার পার্টির এমপি মাইকেল ড্যানবি সংসদে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও দুর্নীতি (ম্যাগনিটস্কি নিষেধাজ্ঞা) বিল ২০১৮ উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের আগে ২০১৯ সালে সংসদ ভেঙে দিয়ে বিলটি বাতিল হয়ে যায়। পরে ২০২১ সালে ৮ ডিসেম্বর, অস্ট্রেলিয়ান সংসদ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘন, গুরুতর দুর্নীতি এবং সুশাসন ও আইনের শাসনকে ক্ষুণ্ণকারী কার্যকলাপের জন্য ম্যাগনিটস্কি স্টাইলের স্যাংশনের আইন আংশিকভাবে পাস করে।

যে আইন অস্ট্রেলিয়াতে সম্পূর্ণভাবে পাশই হলো না, সে আইনে কীভাবে আবিগেইল বয়েড স্যাংশন দাবি করলেন? কূটনীতিকরা বলেন, এটা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুর মেলানো ছাড়া কিছুই নয়।

পরে আরও বলা হয়, প্রস্তাব উত্থাপনকারী আবিগেইল অস্ট্রেলিয়ার সংসদে কতোটুকু প্রভাব বিস্তার করেতে পারেন? তিনি তো অস্ট্রেলিয়ার প্রাদেশিক সংসদের সদস্য, মূল সংসদের নন। খোদ অস্ট্রেলিয়ান কর্মকর্তারা এব্যাপারে কথা বলার সময় বিষয়গুলো হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, অস্ট্রেলিয়া সরকার এই মুহূর্তে এটা মানার কোনো যুক্তিই দেখছে না। কারণ এই আইনের আওতায় মানবাধিকার লঙ্ঘন বা বড়ো ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয় মার্কিন প্রশাসন।

এ নিষেধাজ্ঞায় পড়লে ওই ব্যক্তির সম্পদ জব্দ করা হবে এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। যুত্তরাষ্ট্রের পর কানাডা, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো বেশ কয়েকটি দেশ একই ধরনের আইন পাস করে।

তারা আরও বলেন, অস্ট্রেলিয়ায় যদি বাংলাদেশের ওপর ম্যাগনিটস্কি আইন প্রয়োগ করতে পারেও তাহলেও কী বাংলাদেশে সেই বাস্তবতা আছে? বাংলাদেশে এমন কোনো পরিস্থিতি তো সৃষ্টি হয়নি যেখানে অস্ট্রেলিয়া ম্যাগনিটস্কি স্টাইলে স্যাংশন দেয়া যেতে পারে। এই

দাবি উত্থাপনের পেছনে মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত উদ্বেগের চেয়ে ব্যাক্তি স্বার্থরক্ষাই মুখ্য মনে হচ্ছে।

ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কারণ ম্যাগনিটস্কি স্টাইল স্যাংশন দেয় যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্ররা। এরই মধ্যে রাশিয়া, চীন ও ইরানের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে ওয়াশিংটন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখন্ও সেই পথে হাঁটবে না। কারণ অস্ট্রেলিয়ার সাবেক সরকারগুলির তুলনায় এক বৈচিত্র্যময় পার্লামেন্টের সূচনা করেছে। দীর্ঘ ৯ বছর পর, ২০২২ সালের ২৩ মে অস্ট্রেলিয়ায় সরকার গঠন করে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমন একটা অবান্তর দাবি তুললেন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য আবিগেইল বয়েড? বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের আগে দেশে বিদেশের নানা অপপ্রচারের উদাহরণ টেনে কূটনীতিকরা বলছেন, এটাও বাংলাদেশ সরকারবিরোধী লবিস্টদেরদের সেই পুরোনো স্টাইল। আমেরিকা ব্রিটেন বা অস্ট্রেলিয়ার মত দেশে কোন দলের ফান্ডে টাকা দিলেই তাদের দিয়ে অনেক কিছু বলিয়ে নেয়া যায়। এটা তাদের দেশে খুবই বৈধ বিষয়। আবিগেইল বয়েড একজন ব্রিটিশ বংশোদ্ভুদ আইনজীবী। বিদেশি লবিং প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত এরাই চালায়। সুতরাং তার পক্ষে গ্রিন দলে কিছু ফান্ড নেয়ার বিনিময়ে এরকম একটি প্রস্তাব তুললে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

কানাডায় ছাত্রলীগের উদ্যোগে শেখ হাসিনার জন্মদিন উদযাপন

ছাত্রলীগ কানাডা শাখার উদ্যোগে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছে। কানাডার স্থানীয় সময় ২৮ সেপ্টেম্বর টরন্টোর ডেনফোর্থের রেড হর্ট তন্দুরি হোটেলে এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা

অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনের জন্য দোয়া এবং কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করা হয়।

এতে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কানাডা শাখার সভাপতি ওবায়দুর রহমান, ঢাকা মহানগর উত্তরের সাবেক সহ সভাপতি তাওহীদ খান আশিক, মো. সাকিব, ফয়সাল কবির নাহিদ, সাঈদ রেজাউল ইসলাম রাহুল, মো. রাইহান সরিফ, নেসার মাহমুদ হৃদয়, তৌহিদুর রহমান দুর্জয়, ফাহিম হোসেন, ইশতিয়াক আহমেদ, সোহাগ হোসেন, শেখ তামিম, জিহাদ ও ফাহাদ।

এসময় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ কানাডার যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুল ইসলাম তারেক, সদস্য সিদ্ধার্থ শাহা ও তাজুল ইসলামসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারগুলো ‘দাসপ্রথার বর্তমান রূপ’: জাতিসংঘের প্রতিবেদন

খুব বেশি না, এক তথ্যে তোলপাড় হয়ে গেছে বিশ্ব। সন্তান প্রসবের সময়ও বন্দি কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারগুলোতে। আর পুরুষদের অমানবিকভাবে শ্রমে বাধ্য করা হয়। বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার স্লোগান দিয়ে বেড়ানো দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারের এই চিত্র উঠে এসেছে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে। রয়টার্সে প্রকাশিত এই প্রতিবেদন প্রশ্ন জাগায়- যে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, সেই দেশ অন্য দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় চোখ রাঙায়?

প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের কারাবন্দিদের পরিস্থিতিকে ‘মানুষের মর্যাদার প্রতি সুস্পষ্ট অবমাননা’ হিসেবে বর্ণনা করে ‘পদ্ধতিগত বর্ণবাদী’ বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের আহ্বান জানান মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা। এপ্রিল ও মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি শহরের ১৩৩ জন ব্যক্তির সাক্ষ্য এবং পাঁচটি ডিটেনশন সেন্টার

পরিদর্শন করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে এই প্রতিবেদন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কারাগারগুলোতে বন্দি কৃষ্ণাঙ্গদের মানবেতর অবস্থায় দিনযাপন করতে হয়। সন্তান প্রসবের সময়ও বন্দি নারীদের শিকলে বেঁধে রাখা হয়। এ কারণে ভূমিষ্ঠ শিশুরা অনেক সময়ই মারা যায়। কেবল কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের সঙ্গেই এমন ঘটনা ঘটেছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারের অবস্থা নিয়ে গত কয়েক দশক ধরেই উদ্বেগ ছিল। যেসব কারাগারের রেকর্ড খারাপ, সেগুলো সংস্কার বা বন্ধ করে দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছিল মানবাধিকার সংগঠনগুলো।

জাতিসংঘ নিযুক্ত তিনজন বিশেষজ্ঞের তৈরি করা এই প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের কারা কর্তৃপক্ষের জন্য ৩০টি সুপারিশও করা হয়েছে। সে সঙ্গে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত কারাবন্দিদের ক্ষতিপূরণের দেওয়ার জন্য একটি নতুন কমিশন গঠনের আহ্বানও রয়েছে।

চলুন দেখে আসি তারা লুইজিয়ানার এক কারাগারের বন্দিদের বিবরণ কীভাবে দিচ্ছেন। সেখানে বলা হয়েছে, হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ বন্দিকে ক্ষেতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা কোনো শ্বেতাঙ্গ তাদের নজরদারিতে রাখেন, যেমনটি দেখা যেত দেড়শ’ বছর আগে। লুইজিয়ানার ‘কুখ্যাত’ অ্যাঙ্গোলা কারাগারের এই পরিস্থিতিকে ‘দাসপ্রথার বর্তমান রূপ’ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনটিতে।

সেখানে এখনও আছে নির্জন কারাবাস। নির্জন কারাবাসের ব্যাপক ব্যবহার নিয়েও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিন বিশেষজ্ঞ। প্রতিবেদনে তারা জানান, আফ্রিকান বংশোদ্ভূত কয়েদিদের নির্বিচারে নির্জন কারাবাসে রাখা হচ্ছে। মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের কাছে এক কৃষ্ণাঙ্গ বন্দি বলেন, টানা ১১ বছর তাঁকে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়। তিন বিশেষজ্ঞের একজন হুয়ান মেন্দেজ বলেছেন, ‘আমাদের গবেষণার ফলাফলগুলো অতি দ্রুত বর্তমান এই অবস্থার ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার দিকে নির্দেশ করে। আমরা বেশকিছু সুপারিশ দিয়েছি।’

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক মিশন এই প্রতিবেদন সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। ফেডারেল ব্যুরো অব প্রিজন বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারগুলো বন্দিদের পাশাপাশি কর্মচারি এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বিষয়ে। বাইডেন প্রশাসন ৪টি দেশে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করার বিষয়টি অনুমোদনের জন্য মার্কিন সিনেটে উত্থাপন করেন। বাংলাদেশ, ভারত, চিলি ও ফ্রান্স। পিটার ডি হাস, এরিক এম. গারসেতি, ডেনিস ক্যাম্পবেল, বেরনাডেটে এম. মিহান এই চার জনকে নির্বাচন করা হয়। ৯ জুলাই ২০২১, প্রেসিডেন্ট বাইডেন চার জনকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৩ জুলাই ২০২১, প্রস্তাবটি সিনেটে আসে এবং সিনেট এই প্রস্তাব পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটিতে পাঠায়। ২০ অক্টোবর ২০২১, দীর্ঘ চার মাসে বারবার আলোচনার পরেও কমিটি শুনানিতে বিষয়টি সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়। ৩ নভেম্বর ২০২১, অবশেষে সিনেটর মেনেনডেজের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ক্যাম্পেইনের ফলে কমিটি এই ১৪ জনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ১৮ ডিসেম্বর ২০২১, কণ্ঠভোটে সিনেটে প্রস্তাবগুলো পাস হয়। এই যে সিনেটর মেনেনডেজের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ক্যাম্পেইনের ফলে কমিটি এই ১৪ জনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এখানে যে প্রশ্নটি সবার আগে সামনে আসে তাহলো, কেন সিনেটর মেনেনডেজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই কাজ করলেন?

কেন এই কাজ করলেন সেই উত্তর দেওয়ার আগে সিনেটর মেনেনডেজ সম্পর্কে বলে নেওয়া ভালো, মেনেনডেজ হচ্ছে সেই লোক যিনি ৪ লাখ ৮০ হাজার ডলারসহ ধরে পড়েন। শুধু তাই নয়, স্বর্ণ কেলেঙ্কারিতে সিনেটর মেনেনডেজের নামও জড়িত। সবচেয়ে ভয়ংকর হলো, মিশরে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ে তথ্য পাচার করা এবং অর্থ লেনদেন। এই অর্থ লেনদেনে জড়িত ছিলেন মেনেনডেজের স্ত্রী নাদিন আর্সলানিয়ান।

মেনেনডেজ প্রথম আইনশৃঙ্খলা বাহিনী র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা শুরু করেন এরপর পিটার হাস একের পর এক নিষেধাজ্ঞা তালিকা বর্ধিত করতে থাকেন। এ যেন মেনেনডেজের দেখানো পথেই পিটার হাস হাঁটছেন।

যে দুটি বিষয় আলোচনায় আসেনি তা হলো, বাইডেন যে চার জনকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করার বিষয় আগ্রহ দেখান সেই চার জনের মধ্যে পিটার হাসের ক্যারিয়ার বাকিদের চেয়ে দুর্বল। পিটার ডি হাস ছিলেন সিনিয়র ফরেন সার্ভিসের ক্যারিয়ার সদস্য এবং একই সাথে স্টেট ডিপার্টমেন্টের অর্থনৈতিক ও ব্যবসা বিষয়ক প্রিন্সিপাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে, হাস স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাণিজ্য নীতি ও আলোচনার জন্য সিনিয়র উপদেষ্টা / উপ-সহকারী সচিব ছিলেন।

সিনিয়র উপদেষ্টা / উপ-সহকারী সচিব থেকে পিটার হাসের এত দ্রুত কীভাবে পদায়ন হয় তাও ভাববার বিষয়। কে এই পদায়নের পেছনে যুক্ত ছিল

তাও অনুমান করা যায়। আরও জানার বিষয় হলো, ২১ মার্চ ২০২৩, রাজধানীর এক হোটেলে পিটার হাস ‘দুর্নীতি দূর করতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র’ এইরকম বক্তব্য দেন। প্রশ্ন হলো, পিটার হাস যার সুপারিশে বাংলাদেশে এসেছেন সেই মেনেনডেজের দুর্নীতির খবর সারা পৃথিবী জানে। তবে কি বিষয়টা এইরকম যে, পিটার হাস বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সুবিধা পাইয়ে দিতে বা কোনো বিশেষ মহলের সুবিধার জন্য কাজ করছিলেন?

এই সন্দেহ সরিয়ে দেওয়ার উপক্রম নেই, পিটার হাস আসলে মেনেনডেজের পরিকল্পনায় হাঁটছেন এবং মেনেনডেজের মতো দুর্নীতি বিরোধী কাজের কথা বলে বিভিন্ন উপঢৌকন বা ব্যবস্থার বিষয় হাসিল করতে চাইছেন। এইসব বিষয় যতটা সরলভাবে আমরা ব্যাখ্যা করছি তারচেয়েও অধিক অজানা বিষয় এখনও লুকিয়ে আছে মেনেনডেজ আর পিটার হাসের মধ্যকার লুকায়িত প্রস্তাব বা উদ্দেশ্যের মধ্যে। তাও আমাদের জানা প্রয়োজন।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।